বোশেখী মেলা ও শেয়াল পন্ডিতের কেচ্ছা

খন্দকার জাহিদ হাসান

বোশেখী মেলার সাথে শেয়ালের কোনো অলৌকিক সম্পর্ক রয়েছে কি? মনে হয়, না থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে জীবনে প্রথম শেয়াল দেখি দিনে দুপুরে কোনো এক পহেলা বৈশাখে, যে দিনটিতে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ঐতিহ্যবাহী 'বোশেখী মেলা' বসে।

সালটা ঠিক মনে নেই। তখন বেশ ছোটো আমি। যে বয়স থেকে শিশুরা কিছু কিছু ঘটনা স্মরণে রাখতে শুরু করে, সে-রকম একটা বয়স। রাজশাহী শহরের ঠিক যে জায়গাটায় আমাদের বাসা, এখন সেখানে অজস্র ঘর-বাড়ী ও মানুষজন। কিন্তু ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও আমাদের ঐ মহল্লাটি ছিলো প্রায় পাড়া-গাঁয়ের মতো।

চারিদিকে ছিলো অসংখ্য মাঠ-ঘাট, পুকুর-ডোবা, আর গাছপালা। কন্টিকারি, কালোমেঘের লতা, পট্‌কা লতা, অনন্তমূল, ইত্যাদি ছাড়াও এমন জাতের সব গুল্মলতা ও ঝোপ-ঝাড় ছিলো তখন, যা এখন আর সচরাচর দেখা যায় না। ডাহুক, হল্‌দে পাখী, বৌ-কথা-কও ছাড়াও এমন সব পাখীর গান শোনা যেতো, যাদের অনেক প্রজাতিই হয়তো এতদিনে বিলুপ্তির পথে। দিনের বেলাতেও দেখা যেতো হরেক রকমের গিরগিটি, বেজী আর সাপ। রাতে শোনা যেতো পেঁচা ও শেয়ালের ডাক।

সারারাত আমাদের পুকুরটায় সশব্দে ভোঁদড় ঝাঁপিয়ে মাছ ধরে বেড়াতো। আর সকালবেলা পুকুরপাড়ে পাওয়া যেতো তাদের ফেলে যাওয়া উচ্ছিষ্ট মাছের কাঁটা। তাই দেখে আফসোসে আমাদের নানাজী ভোঁদড়ের গুষ্টি উদ্ধার করতেন। নানারা ছিলেন আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী এবং সেই পুকুরটার অর্ধেক অংশীদার।

এক রোদ-ঝলমল সকালের কথা। একা একা গুটি গুটি পায়ে যেইমাত্র আমাদের বাসার পেছনটায় হাজির হোয়েছি, দেখলাম, কুকুর-সদৃশ একটা প্রাণী সড়াৎ করে আমাদের এলাকা থেকে পেছনের প্রতিবেশীদের বাগানের দিকে দৌড় দিলো। বিরাট একটা বাহারী লেজ জন্তুটার পেছনে ঝুলছিলো। 'আরে, ইনিই তো আমাদের শেয়াল পন্ডিত!'– সহজেই চিন্‌তে পারলাম, কারণ ছবিতে উনাকে আগে আমার দেখা ছিলো কিনা! বোধ হয় মুরগী-টুরগী ধরার ধান্দাপানি করছিলেন পন্ডিতজী।

যে বাগানের দিকে শেয়ালটা দৌড় মেরেছিলো, সেটি ছিলো আমার খেলার সাথী আব্দুল্লাহ্‌দের বাগান। দুই জমির সীমানাতে ছিলো কাঁটাতারের বেড়া। তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে শেয়ালমামা সেই বেড়াটাতে গেলেন আট্‌কে। তারপর 'কাঁই-কুঁই' শব্দ করতে করতে কোনো রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার পর ভোঁ-দৌড় লাগালেন তিনি।

ঐ পথেই ছিলো এক পুকুর-পাড়। দিনের আলোতে পন্ডিতজীকে ওভাবে দৌড়াতে দেখে সেই পুকুরে যতো হাঁসাহাঁসি সাঁতার কাটছিলো, তারা সবাই

সমঃস্বরে উচ্চকণ্ঠে শুরু করে দিলো প্রচন্ড হাসাহাসি। (বড়ো হোয়ে নিজেই একদিন ব্যাপারটার সঠিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাই। আসলে হাঁসগুলো সেদিন ভয় পেয়ে ও-রকম চেঁচামেচি করছিলো, মোটেও হাসাহাসি করছিলো না।)

লক্ষ্য করলাম, আমাদের সব পোষা মুরগীগুলো গাছের ডগায় আশ্রয় নিয়েছে এবং সেখান থেকেই সবাই মিলে তারঃস্বরে জরুরী অবস্থার ঘোষণা দিয়ে চলেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় নানাজী আমাদের তিন ভাইকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। সেখানে উপস্থিত হতেই তিনি আমাদের হাতে তুলে দিলেন সেদিনকার এক বোশেখী মেলা থেকে তাঁর কিনে আনা বাতাসা, রংগীন বিস্কুট আর খেল্‌না বাঁশী। জিনিসগুলো পেয়ে আমরা যে কি পরিমাণ খুশী হোয়েছিলাম, তা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।
এভাবেই সেই চমৎকার দিনটিতে বোশেখী মেলার সাথে শেয়াল পন্ডিতের একটা কাল্পনিক সম্পর্ক আমার মনে গাঁথা হোয়ে গেল।

তার ঠিক দু'বছর পর আমাদের তিন ভাইয়ের এক অভাবনীয় সুযোগ ঘটে গেল ছোটোমামার সাথে সশরীরে বোশেখী মেলাতে যাওয়ার। বাসা থেকে কিছু দূরে পদ্মা নদীর তীরে মেলা। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, পায়ে হেঁটে মেলাতে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে এক পুকুরপাড়ে সেদিনও এক শেয়াল মশাইয়ের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হোয়ে গেল। দৈব যোগাযোগ আর কাকে

বলে! পুকুরের যে পাড় দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছিলাম, তার উল্টো দিকের পাড়ে শেয়ালটা কাঁকড়া শিকারে ব্যস্ত ছিলো। তবে শিকারের পদ্ধতিটা ছিলো বড়োই বিচিত্র এক তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল! তত্ত্বটি নিম্নরূপঃ

''কোনো শেয়াল যদি কোনো কাঁকড়ার গর্তে লেজ ঢুকিয়ে কাঁকড়ার শান্তি বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়, তবে সেই শেয়ালের এ-হেন ন্যাক্কারজনক ও উস্কানিমূলক আচরণের জোরালো প্রতিবাদ করা কাঁকড়া সাহেবের নৈতিক দায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য হোয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতিবাদের একটাই ভাষা জানা আছে কাঁকড়ার। তা হলোঃ শক্ত ও ধারালো খাঁজকাটা তলোয়ার-সদৃশ পা দু'টো দিয়ে আচ্ছামতো শেয়ালের লেজ আঁকড়ে ধরা। শেয়াল পন্ডিতও অবশ্য সেটাই চান। কারণ তখন বেকুব কাঁকড়াটাকে এক ঝট্‌কাতে ডাংগাতে তুলে উদরস্থ করা তাঁর পক্ষে সহজ হোয়ে দাঁড়ায়।''

কতোক্ষণ এই অভূতপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করার পর আমরা সবাই আবার মেলার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো অপার বিস্ময়। এত নানান রকমের মানুষের সমাবেশ ও এত রকমারী ধরণের মজার জিনিসের সমারোহ আমরা তার আগে আর কখনো দেখিনি।

ছোটোমামা হাসিমুখে আমাদের দিকে তাকালেন। যেন নীরবে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন, ''বুঝলি, ইহাকেই 'বোশেখী মেলা' বলা হয়!''

মেলাতে আমরা 'ঘুরে বেড়ালাম' বল্‌লে ভুল করা হবে। আসলে সেদিন অনেক্ষণ ধরে সেই বোশেখী মেলার আকাশে আমরা যেন উড়ে উড়ে বেড়ালাম। খাবার জিনিস কিনে খেলাম— রংগীন বিস্কুটের তৈরী হাতী-ঘোড়া, ভুট্টার খৈ, আর বাতাসা। কিছু বেঁধে নিলাম বাসাতে রেখে আসা আমাদের সবচেয়ে ছোটো ভাইটার জন্য। আরো কিনলাম রঙ-বেরঙের অনেক খেল্‌না ও বেলুনওয়ালা বাঁশী। বেশ কিছুক্ষণ নাগরদোলার চরকিতে চেপেও ঘুরলাম।

যাই হোক, আমার জীবনে বোশেখী মেলার সংগে শেয়াল পন্ডিতের এটাই ছিলো দ্বিতীয় অদ্ভুত যোগাযোগ। তৃতীয় ঘটনাটিকে ঠিক 'যোগাযোগ' না বলে 'বিয়োগাবিয়োগ' বলাই ভালো। কারণ ব্যাপারটা ছিলো বিয়োগান্তক।

তৃতীয় ঘটনার আগে ইতিমধ্যে বেশ ক'বছর গড়িয়ে গেছে। টের পাচ্ছিলাম, চারিদিকে মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, আর সেই সাথে কমে যাচ্ছে গাছপালা, পাখ-পাখালী ও বুনো জীব-জন্তুর সংখ্যা। শেয়ালের দেখাও আর আগের মতো মিলতো না। বোশেখী মেলাতেও আমাদের আর যাওয়া-টাওয়া হতো না। আশেপাশে মেলার তেমন কোনো আয়োজনও আর হতো না।

তবু এক সন্ধ্যায় শুনলাম যে, পরদিন রাজশাহী শহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে দারুশিয়া হাটের উপকণ্ঠে বোশেখীমেলা অনুষ্ঠিত হবে। 'যাবো, কি যাবো না'— এই ভাবতে ভাবতে রাতে ঘুমোতে গেলাম।

পরদিন সকালবেলা আমার এক ছোটো ভাই বাইরে থেকে ঘুরে এসে খবর দিলো যে, কিছুক্ষণ আগে কয়েকটা দুষ্টু ছেলে নাকি 'ভাটা পুকুরে' (আমাদের পাড়ার সবচেয়ে বড়ো পুকুর) একটা শেয়ালকে ডুবিয়ে মেরেছে এবং ঘটনাটি সে নিজের চোখে দেখেছে।

কিভাবে যেন দলছুট্ শেয়ালটা নচ্ছাড় ছেলেগুলোর খপ্পরে পড়ে। ওরা বেচারাকে তাড়া করে পুকুরটাতে এনে ফেলে। তারপর শেয়ালটা সাঁতার কেটে পুকুরের যে পাড় দিয়েই ওঠার চেষ্টা করে, তার আগেই বিচ্ছুগুলো সেই পাড়ে হাজির হোয়ে যায় এবং সবাই মিলে প্রাণপণে ওর দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। বেচারা স্থলচর শেয়ালটা আর কতোক্ষণ-ই বা ওভাবে জলে ডুব-সাঁতার চালাতে আর ঢিল সহ্য করতে পারে? এক সময় সে ভীষণভাবে হাঁপিয়ে ওঠে এবং আস্তে আস্তে পানির নীচে তলিয়ে যায়!!!

কোনো মানুষ নয়, এমনকি পোষা কোনো কুকুর-বেড়াল, গরু-ছাগলও নয়, সামান্য একটা বুনো শেয়াল-ই তো মরেছিলো সেদিন! তবু খবরটা শোনার পর কেন যেন গভীর এক বিষাদে আমার মনটা ভরে গেল। আর সেই

বিষণ্নতা ধীরে ধীরে আমার অনুজদের মধ্যেও সংক্রামিত হলো। বোশেখের আনন্দ-মেলাতে আর সেদিন যাওয়া হয়নি আমাদের।

শুধুমাত্র শেয়াল-হত্যার কারণেই যে সেদিন অতোটা মূষড়ে পড়েছিলাম আমরা, ঠিক তা নয়। তার সংগে যেন আরো কিছু ছিলো। বেশ টের পাচ্ছিলাম যে, আমরা, অর্থাৎ এই আধুনিক মানুষেরা শেয়াল-ভোঁদড় বা হালখাতা-বোশেখীমেলা ছাড়াও আমাদের প্রকৃতি ও কৃষ্টির অন্তর্গত আরো অনেক অমূল্য সম্পদ যেন ক্রমশঃ হারিয়ে ফেল্‌ছি.....

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ১৩ এপ্রিল ২০০৬